স্বনির্বাচিত গল্প

স্বনির্বাচিত গল্প

হাসান আজিজুল হক

স্বনির্বাচিত গল্প
হাসান আজিজুল হক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ৪৭৫ টাকা

Swanirbachita Galpo by Hasan Azizul Haque Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2020
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 475 Taka RS: 475 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94103-2-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

অকালপ্রয়াত চিরবন্ধু
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে

ভূমিকা

আমি তো খুব বেশি সংখ্যক গল্প লিখিনি। ইতোমধ্যেই অনেকগুলো সংগ্রহ বেরিয়েছে। একই গল্প দুই তিনটি সংগ্রহে ঢুকে গেছে। আমার *সুনির্বাচিত গল্প* বেরিয়েছে, *নির্বাচিত গল্প* বেরিয়েছে। এখন *কবি প্রকাশনী*র প্রকাশক আমার স্নেহভাজন সজল আহমেদ চাইছেন আমার একটি স্বনির্বাচিত গল্পের বই প্রকাশ করতে। এই সংগ্রহে যে গল্পগুলো থাকল তার সবকয়টি গল্পই ইতোমধ্যে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই স্বনির্বাচিত গ্রন্থে নতুন গল্প সম্ভবত দু-চারটি আছে। ইতোমধ্যে অন্য সংগ্রহে গৃহীত দু-চারটি গল্প হয়তো বর্তমান সংগ্রহের মধ্যেও থেকে যাবে। পাঠকদের সহানুভূতি কামনা করছি এবং সেই সঙ্গে বর্তমান প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হাসান আজিজুল হক
রাজশাহী
ফেব্রুয়ারি, ২০২০

সূচিপত্র

সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য

শকুন ১১
তৃষ্ণা ১৯
একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে ২৯
উত্তর বসন্তে ৪০
মন তাঁর শঙ্খিনী ৫১

আত্মজা ও একটি করবী গাছ

আত্মজা ও একটি করবী গাছ ৬৪
সারাদুপুর ৭২
আমৃত্যু আজীবন ৮০

জীবন ঘষে আগুন

খাঁচা ১০০
জীবন ঘষে আগুন ১১২

নামহীন গোত্রহীন

ভূষণের একদিন ১৫২
নামহীন গোত্রহীন ১৬০
কৃষ্ণপক্ষের দিন ১৬৯
ঘরগেরস্থি ১৮৯
কেউ আসে নি ১৯৯
ফেরা ২০৮

পাতালে হাসপাতালে

মধ্যরাতের কাব্যি ২১৭
সরল হিংসা ২২২
সাক্ষাৎকার ২২৯
পাতালে হাসপাতালে ২৩৭

আমরা অপেক্ষা করছি

মাটির তলার মাটি ২৬০
পাবলিক সার্ভেন্ট ২৬৮
অচিন পাখি ২৮৩

মা-মেয়ের সংসার

মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছে ২৯২
মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত ২৯৯
ঘের ৩০৬
জননী ৩১৩
মা-মেয়ের সংসার ৩২০

রোদে যাবো

রোদে যাবো ৩৩০
খুব ছোট্ট নিরাপদ নির্জন ৩৩৬
ঝড় ৩৪৬
নিশীথ ঘোটকী ৩৫০

শকুন

কয়েকটি ছেলে বসে ছিল সন্ধ্যার পর। তেঁতুলগাছটার দিকে পিছন ফিরে। খালি গায়ে ময়লা হাফশার্টকে আসন করে। গোল হয়ে পা ছড়িয়ে গল্প করছিল। একটা আর্তনাদের মত শব্দে সবাই ফিরে তাকাল। তেঁতুলগাছের শুকনো ডাল নাড়িয়ে, পাতা ঝরিয়ে সোঁ-সোঁ শব্দে কিছু একটা উড়ে এলো ওদের মাথার ওপর। ফিকে অন্ধকারের মধ্যে গভীর নিকষ একতাল সজীব অন্ধকারের মত প্রায় ওদের মাথা ছুঁয়ে সামনের পড়ো ভিটেটায় নামল সেটা।

হৈ-চৈ করে উঠল ছেলেরা, ছুটে এলো ভিটেটার কাছে। আবছা অন্ধকারে খানিকটা উঁচু মাটি আর অন্ধকার একটা ঝোঁপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না তাদের। ওদের সর্দার ছেলেটি বুঝতে পারল, হামেশা দেখা যায় এমন পাখিদের মধ্যে শকুনই তীব্রবেগে মাটিতে নেমে তাল সামলানোর জন্যে খানিকটা দৌড়ে যায়। তাই তার চোখেই প্রথম পড়ল অন্ধকারের তালটা দৌড়তে দৌড়তে খানিকটা এগিয়ে বিব্রত হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে গেল।

অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেটি বলল ভয়চকিতস্বরে, কিরে ওটো? আর একজন জবাব দিল, মুটেই বুঝতে পারচি না।

পাখি ওটো।

পাখি-টাখি হবে।

ক্যা জান জানে, সঞ্জেব্যালায় ক্যার মনে কি আচে? সে বুকে থু থু দিল।

অনড় হয়ে রয়েছে অন্ধকারের দলাটা। লুকিয়ে যাওয়ায় একটা ভাব, পারলে কোন বহু পুরনো বটের কোটরে, কোন পুরীষ গন্ধে বিকট আবাসে, কোন নদীর তীরে বেনাঝোপের নিচে শেয়ালের তৈরি গর্তে লুকিয়ে যাওয়ার মতলব।

শালা ক্যার মনে কি আচে, ক্যা কি চায়, ক্যার ভ্যাকে ক্যা আসে। চ বাড়ি যাই।

দলের মধ্যে গরু চরানো রাখাল আছে। স্কুলের ছাত্র আছে। স্কুলের ছাত্র অথচ দরকার হলে গরু চরায়, ঘাস কাটে, বীজ বোনে এমন ছেলেও আছে।

তু তো ভীতু, দ্যাখলোম একটো জিনিস, শ্যাষ পর্যন্ত দেখি দাঁড়া।

না, আমি চলে যাব।

তু যা গা তবে, আমরা যাব না।

ক্যারে বাড়ি যেচিস, তেঁতুলতলাটা পার হয়ে দ্যাখগা। স্কুলে পড়ে সেই ছেলেটি বলল, জিনিসটো দেখতে হবে।

প্রায় সবাই দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বড় ছেলেটা এগিয়ে এল। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে।

সর্দার ছেলেটি জানত, সেটা একটা বুড়ো শকুন। একেবারে কাছে এগিয়ে গেল সে। এত কাছে যে হাত বাড়ালে ধরা যায়।

শালা, ক্যার মনে কি আচে, ক্যার ভ্যাকে ক্যা আসে—রাখালটা তখনও বিড়বিড় করছে।

একটা দমকা বাতাসে অজস্র শুকনো পাতা ঝরে পড়ল। পুকুরের পানিতে প্রথমে মৃদু কম্পন, তারপর ছোট ছোট ঢেউ উঠল—কার হাত থেকে কোথায় ধাতব কিছু পড়ে বিশ্রী অস্বস্তিদায়ক একটা শব্দ হলো।

ছেলেটা খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল সত্যিই সেটা একটা শকুন, আলো থাকতে থাকতে বাসায় ফিরতে পারে নি। এখন রাতকানা। উগ্র একটা দুর্গন্ধ ওর নাকে এল। ভাগাড়ের আঁশটে গন্ধ। গলিত শবদেহের পচা পাঁকে সে যেন এইমাত্র স্নান করে এসেছে। শকুন কুকুরে লড়াইয়ের শেষ চিহ্ন এখনও একটা ছিটকে বেরিয়ে-আসা মোটা খসখসে নোংরা পালক থেকে টের পাওয়া যায়।

মারামারি করেচে শালা ঠিক সারা দোপরবেলা। এখনও ধুকচে।

পলটু এগিয়ে এল। পিছু পিছু জামু, এদাই। আরও অনেকে যারা ছিল।

পলটু বলল, শিকুনি লয়?

হ্যাঁ, দেখতে পেচিস না?

মোল্লা শিকুনি লয় তো?

বোধহয় মোড়ল শিকুনি।

রাখাল জামু বলল, মেদী না মদা বলতে পারলে বলি হ্যাঁ!

সর্দার রফিক বলল, তু তো গরু। তাই গরুর মতন কথা বলিস।

শকুনটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। বোধহয় সে পছন্দ করছে না এই বিরক্তিকর অবস্থাটা। রফিক হাঁক দিল, আয়, খানিক মজা করি—আয় লাচাই খানিকটো ওটোকে।

হৈ-চৈ করে উঠল ছেলের দল। বাড়ি যাবার ইচ্ছা অথচ ভয়ে তেঁতুলতলাটা পার হতে পারছে না সেই যে ছেলেটি, সেও চেঁচিয়ে উঠল।

রফিক এগিয়ে শকুনটার ডানা ধরে ফেলল। এতক্ষণে চেতে উঠল কুৎসিত পাখিটা, অত সহজে সে ধরা দিতে চায় না। নোংরা বিরাট দুটো পাখা মেলে বিচ্ছিরি নখওয়ালা পা-দুটো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চালিয়ে দৌড়ুতে শুরু করল সে গাঁয়ের সরু গলিটার মধ্যে দিয়ে।

এইভাবেই ওরা ওড়বার প্রস্তুতি নেয়, ভারমুক্ত হবার চেষ্টা করে। বোধহয় সে শেষ পর্যন্ত উড়তে পারত, অন্তত মুক্তি পেত এই অসহনীয় কিশোরদের হাত থেকে, তাদের হিংস্র কৌতূহল আর প্রাণান্ত খেলার খপ্পর থেকে। কিন্তু তার চোখে দৃষ্টি নেই, চলার কোন উদ্দেশ্য নেই। শকুনটার মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। পেছনে

পেছনে একদল খুদে শয়তানের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ ছেলের দল নিষ্ঠুর আনন্দে ধাওয়া করেছে।

কিন্তু পাখিটা পার হতে পেরেছে অন্ধকার গলিটা। কারণ গলিটা কানাগলি নয়। গলির দুপাশের দেয়ালের ফুটোয় যে সাপগুলো গ্রীষ্মের গরমে গলা বের করে থাকে, যদি তারা সেই অবস্থায় থাকত তাহলে নিশ্চয়ই মাথা আবার গুটিয়ে নিয়েছে।

কুলতলার পাশ দিয়ে, আরও দুটো পড়ো ভিটের ওপর দিয়ে, হাড়গোড় জড়ো-হওয়া টুকরো জমিটার নীরস আর্তনাদ উপেক্ষা করে জীবটা অনবরত ডানা মেলে ওড়বার চেষ্টা করছে, আরও দ্রুত দৌড়ুচ্ছে, আরও পরিষ্কারভাবে পথ চিনতে চাচ্ছে—পালাতে চাচ্ছে। কিন্তু সে নিস্তেজ, উপায়হীন। আক্রমণ করতে জানে না। দারুণ রোষে ছেলেদের দলের মধ্যে পড়ে তীক্ষ্ণ-ঠোঁটে এদের খেলার আয়োজন বন্ধ করে দিতে পারছে না।

চিৎকার করে কে আর্তনাদ করে উঠল। তার পায়ে শুকনো হাড়ের চোখাদিক ফুটে গিয়েছে।

আচ্ছা উ বসে থাকুক, শিকুনিটোকে ধরবুই। চেঁচিয়ে বলে উঠল রফিক।

হ্যাঁ, তু বোস, আমরা ওটোকে ধরবুই।

নাইলে তু বাড়ি যা।

এঃ লউ পড়ছে যি।

যাকে লেগেছে সে বলল, পড়ুক যা। বলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার ছুটল। সামনেই একটা এঁদো ডোবা। মোড় ফিরেই মাটি ছাড়ল, উড়ল সে। কিন্তু বড় ইতস্তত, বড় অনিশ্চিত তার পক্ষসঞ্চালন। হয়ত হাঁফ ধরে গিয়েছে, ক্লান্ত হয়েছে সে। হয়ত দিকনির্ণয় করতে পারে নি। সে পড়ল ডোবাতে, পানি ছিটকে, নোংরা মোটা পানির ঢেউ তুলে যেসব ঢেউ আঁধারে চকচকে চোখে চেয়ে রইল, প্রায় শোনা যায় না এমনিভাবে আঘাত করল তীরে।

একটি কদর্য জীব হিঁচড়ে উঠল ওপারে।

পরিবর্তিত, ভিজে, ধুলোমাখা।

ছেলেরা দৌড়ে এসেছে এপারে।

গ্রামের ঘনবসতি পাতলা হতে হতে এখানে ছিটিয়ে গিয়েছে। কালো কালো স্তূপের মত হঠাৎ হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে। সহজবুদ্ধিতে ফাঁকফোকর দিয়ে জন্তুটা পড়ল মাঠে। খোলা বিস্তৃত মাঠে।

ছেলেরা পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তারাও হাঁফিয়ে উঠেছে।

শালা কত দড়বি দড়—যিখানে যাবি চ।

আর লয় মানিক, আর লয়।

তুমার ইবার হয়ে আলচে।

অকে ধরবুই আজ।

হ্যাঁ, ধরবুই।

এবার আল টপকে উঁচুনিচু এবড়ো-খেবড়ো জমি পেরিয়ে পগার আর শিশুশস্যের ওপর দিয়ে—শেয়ালকুলের কাঁটায় জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মরণ-প্রতিজ্ঞায় ক্ষেপে উঠল ছেলের দল।

এদাই জিগ্‌গেস করল রফিককে, কি করবি উটোকে ধরে?

কিছু করব না, শুধু ধরব।

তা পর?

হুঁ।

হুঁ ক্যানে, তা পর কি করবি?

এগু ধরে তা পর অন্য কাজ।

কেউ আর কথা বলছে না। বলতে পারছে না। ভূতের মত, অন্ধকারে চলন্ত চঞ্চল বিভীষিকার মত ছুটেছে।

দক্ষিণদিকের বাতাস গায়ে লাগছে না। দূরে বাবলাবনের পাশে আমের পাতা ভাঙার মড়মড় মসমস শব্দ কানে আসছে না। কিংবা শেয়াল ডেকে উঠল, কি ঝিঁ ঝিঁ সিমেন্টের মেঝেতে পাথর ঘষার মত একটানা শব্দ করছে, কি প্রতি পদক্ষেপে পায়ের নিচের নাড়া গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, অন্ধকার ঘনতর হয়েছে এসব কিছুই না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই ধরে ফেলল ওকে। আঁকড়ে জাপটে দুমড়ে ধরে ফেলল শকুনটাকে। তারা বুক দিয়ে অনুভব করল হাঁপরের মত ফ্যাসফেসে শূন্য শব্দ উঠছে শকুনটার ভিতর থেকে। দীর্ঘশ্বাসের মত—ফাঁপা, শূন্য, ধরা-পড়ার।

ছেলেগুলোর উত্তেজিত বক্ষস্পন্দন পাখিটা অনুভব করতে পারল কি?

সেই, সেটোই বটে তো?

যেটোর পেচু পেচু অ্যালোম এটো সেই শিকুনিটোই বটে তো?

ক্যানে, পেত্যয় হচে না তোর?

কি জানি ক্যামন পারা লাগচে।

ক্যামন ভকভক করে বই বেরুইচে দেখচিস?

বই কি র‍্যা বল দুগ্‌গন্ধ।

তাতে বই কমচে কি?

অর্থাৎ দুর্গন্ধ কমছে কি?

ভিজে গিয়ে চিমসে গন্ধ ছাড়ছিল শকুনটা। জমাট গন্ধ তরল হয়ে এসেছে। গলা গলা দম আটকানো গন্ধ।

রফিক বলল, লে এ্যাখন ধর এটোকে—ঠোঁটটো ধরতে হবে না—দোম বন্ধ হয়ে যাবে। রাখালটা এগিয়ে এল, শালোকে আমি ধরব। পীরিত ক্যাকে বলে দেখবি শালো!

একদিকে জামু আর একদিকে রফিক ছড়িয়ে মেলে ধরল শকুনটার বিশাল শক্তিশালী পাখ দুটো।

কি পেল্লাই ড্যানা র‍্যা—আট ল হাত হবে।

গোটানো ঘনবুনুনির পালক মেলে গেল। বুনট যেন পাতলা হয়ে এল। স্তরে স্তরে সাজানো পালক পাশাপাশি চওড়া হয়ে কারকিত করা গালিচার মত বিছিয়ে যাওয়ার কথা—কিন্তু শকুনটা ভিজে গিয়েছে, ধুলো লেগে গুটিয়ে গিয়েছে তার পালক। এখন তাই অনেক ফাঁক, পাশাপাশি পালক অনেক ছিটোনো ছিটোনো। দুই ডানা অসহায়ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল শকুনটা।

এবার দ্বিতীয় দফা দৌড়।

দড় দড়—লেংগুড় তুলে দড়।

শকুনের পা পারে না অতো জোরে তাল দিতে। কিন্তু তাতে কি-ই বা এসে যায়! পা না হয় মাটিতে পড়চে না। ছেলেদের দৌড়ের গতিই চানচে তাকে—হিঁচড়ে নিয়ে যাবে।

এ্যাদা, মুখটো ঠুকে গেল। কি টেনে লিয়ে যেচিস দ্যাক, মরে গেল লিকিন দ্যাক এগু।

ক্যার গরজ কেঁদেছে দ্যাকবার। মরাটোকেই টানব।

ভয়ানক হুল্লোড় করে ওরা দৌড়ুচ্ছে এই টানার পিছু পিছু। চেঁচাতে চেঁচাতে। ভারি মজা পেয়ে। অদ্ভুতরকমের খেলা পেয়ে। কি লাভ?

লাভ?

লাভ, তোকে দেখে লোব—তু তো শিকুনি, তোর গায়ে গন্ধ, তু ভাগাড়ে মরা গরু খাস, কুকুরের সাথে ছেঁড়াছিঁড়ি করিস—তোকে দেখে রাগ লাগে ক্যানে?

ছেলেদের কথায় শকুনটাকে দেখে তাদের রাগ লাগে, মনে হয় তাদের খাদ্য যেন শকুনের খাদ্য, তাদের পোশাক যেন ওর গায়ের গন্ধভরা নোংরা পালকের মত; সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুন বলে কেন। কেন মনে হয় শকুনটার বদহজম হয়েছে। যে ধূসর রঙটা দেখলেই মন দমে যায় তার সঙ্গেই এর রঙের এত মিল থাকবে কেন। প্রায় জীবন্ত, ফেলে দেওয়া যে শিশুগুলোকে গর্তে, খানা-ডোবায়, তেঁতুলতলায় ছেলেরা দেখে, না বোঝার যন্ত্রণায় মন যখন হু হু করে ওঠে, তখন তাদের কচিমাংস খেতে এর এত মজা লাগে কিসের!

কে বলল, ভোক লেগেছে।

কিছু খাস নাই?

দোপরবেলায় গোস্ত দিয়ে ভাত।

আমিও—আমারও ভোক লেগেছে।

তোর জামার রঙটো দেখে রাগ লাগে।

য্যামন মোটা, তেমনি খসখসে।

ঠিক শালা শিকুনিটোর মতুন।

হামিদের বাপটে দু'একদিনের ভিত্‌রেই মরবে। আজ সারা বৈকালি কি করচে জানিস?

জানি—খালি হাঁফিয়েছে—এই শালোর মতুন।

জামু বলল, সব শালোর হাঁফানির ব্যায়রাম। ওরে শালা, পালাইতে চাও, শালা শিকুনি, শালা সুদখোর অঘোর বোষ্টম।

অঘোর বোষ্টমের চোহরারার কথা মনে পড়তে হা হা করে হেসে উঠল সবাই।

মাতামাতি চলে, আল টপকে টপকে, উঁচুনিচু জমির উপর দিয়ে, ক্ষতবিক্ষত মনে আর দাগরা দাগরা ঘায়ে, শেয়াকুল আর সাঁইবাবলার বনে, লম্বা শুকনো ঘাসে, পগারে, সাপের নিশ্বাসের মত ফাটা মাটির উষ্ণ ভ্যাপসা হাওয়ায়, আখ আর অড়হর কাটা জমির বল্লমের মত ছুঁচলো সরল গুঁড়ির আক্রমণে ও আর্তনাদে। একটা মাটির ঢেলার মত গড়িয়ে গড়িয়ে, শক্তির বেদনাবোধের অতীত অবস্থায়, আচ্ছন্ন চেতনাহীন তন্দ্রার মধ্যে শকুনটা শুধুই চলেছে। যখন ছেলেরা বিশ্রাম নিচ্ছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে ক্ষতের রস মুছলে প্যান্টে, শকুনটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। পালানোর অসম্ভব চেষ্টা করছে না সে।

কত তারা উঠেছে দ্যাক।

কিন্তুক আলো তো হচে না।

চাঁদ নাইকো যি।

বাতাস দিচে লয়রে?

দিচে, তা শালার গরম বাতাস।

আমার কিন্তুক জাড় লাগচে।

তোর ভয় লেগেচে।

কতদূরে এলোম র‍্যা?

উরে সব্বোনাশ, মাঝমাঠে এসে পড়িচি, মানুষমারীর মাঠ যে র‍্যা! উইটো নিচ্চয় কেলেনের পাড়।

চ কেলেনের পাড়ে যাই, আর একবার গা ধোয়াই গা চ শিকুনিটোকে। পথটা ঠাহর করা যায় না। চারদিকের গাঁ ঝাপসা। দিশাহারা মনে হয়, এতবড় আকাশ, এত অন্ধকার।

জামু বলে, শুনিচিস রাত দোপরে কি সব হয়?

হেই ভাই পায়ে পড়ি, বলিস না।

যিখানে সিখানে তেঁতুলগাছ দেখা যায়। ঘরের খিল খুলে মেয়ে হোক আর মরদ হোক ঘুমের ঘোরে ঘোরে মাঝমাঠে চলে আসে। দ্যাখে, খালি শালা তেঁতুলগাছ আর মিশমিশে কালো বিলুই। যিদিকে তাকাও খালি বিলুই আর বিলুই। ক্যার ভ্যাকে ক্যা আসে—শকুনটাকে হঠাৎ কালো বিড়াল বলে মনে হয়।

ছেলেদের আর কারো গায়ে হাত দেবার সাহস নেই। নিজের নিজে বুকে হাত দিয়ে অনুভব করে।

একটা বেপার তো হতে পারে, ধর্ সবাই ভূত আর সবাই মানুষের ভ্যাকে এয়েছে।

না, না, আমি ভূত লই, এ্যাদো আমি মানুষ।

তাইলে আমাকে ছুঁয়ে দ্যাক, আমি যদি মানুষ না হই, আমি উড়ে মিলিয়ে যাব। ছোঁ আমাকে।

আমি ছুঁতে পারব না।

সবাই সবাই-এর থেকে সাবধান হয়ে ক্যানেলের পাড়ে বসল। একে অপরের দিকে তীব্র চোখে তাকাচ্ছে। তারপর নিজের হাতে চিমটি কাটছে। শকুনটাকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। সে দুটো ডানা ঝেঁপে, পা দুমড়ে মাটিতে গোঁজ হয়ে পড়ে আছে।

রাত দোপর ঘুরে গেয়েচে লয়?

এ্যাকন সাঁজও লাগতে পারে আবার দোপর রাতও হতে পারে।

বোধহয় তাই। তাদের হিসেব নেই। এ সময়টুকু ঠিক সময় নয়।

এ খেলাটা তাদের সময়ের বাইরে ঘটেচে যেন।

তবু কে বলল, তিনবার শেয়াল ডেকেচে।

তাইলে পেরায় শ্যাষ রাত

চ ভাই, পানিতে নামি।

পাগলের মত ছুটে ক্যানেলে নামল ছেলেরা।

একটা বাতাসও সঙ্গে সঙ্গে অগভীর পানির উপর দিয়ে সরসর করে এসে ওদের চোখে মুখে লাগল; কি একটা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল।

আর একবার স্নান করল শকুনটা।

শালা কিছু খাবে না?

কি খাবে—মরা আচে এখানে যে খাবে!

জামু বলল, ভুঁই-এর লাড়া ছিঁড়ে লিয়ে আয়, ঐ খাক শালা।

তাই নিয়ে এল কে। রফিক বলল, গরু তো লয় যে খ্যাড় খাবে। কিন্তুক এখন ঐ শালাকে তাই গিলতে হবে।

হ্যাঁ, লাও গেলাও।

দেখি র‍্যা, তোর ছড়িটা দে।

হ্যাঁ, ঠিক অমনি করে অর ঠোঁটটো চিরে ধর।

খ্যাক খ্যাক করে শব্দ করে উঠল শকুনটা। তার ঘাড় মুচড়ে ঠোঁট ফাঁক করে অতি সাবধানে ছেলেরা তাকে খড়ের টুকরো খাওয়াচ্ছে।

খা শালা, মর্ শালা।

আমিও লোব, মুটুক করব।

রফিক সব থেকে বড় পালকটা ছিঁড়ে নিল। মাংসের ভিতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো পালকটা। শিউরে উঠলো যেন শকুনটা। তারপর সবাই ছিঁড়ল।

কদাকার বড় মুরগির মত দেখাতে লাগল তাকে।

তারা সবাই ফিরছে। টলতে টলতে। বসে দাঁড়িয়ে। হোঁচট খেতে খেতে।

ছেঁড়া শার্ট দেখতে দেখতে। আগামীকালের কথা ভাবতে ভাবতে। গাঁয়ে ঢুকতেই এপাশে তালগাছ ওপাশে ন্যাড়া বেলগাছের যে ছোট তোরণটি আছে তারই আবছা ছায়ায় শাদামত কি দেখা যাচ্ছে।

জামু বলল, উদিকে যাস না—চ ঘুরে যাই।

তোর বাড়ি তো উদিকেই—চ দেখি না না উ দুটো কি।

বাড়ি কাচে বলেই জানি উ শালা শালী ক্যা?

কা র‍্যা?

দরকার কি তোর শুনে?

বল্ ক্যানে?

উ হচে জমিরদ্দি আর কাদু শ্যাখের রাঁড় বুন।

কি করচে উখানে?

আমড়ার আঁটি। চ বাড়ি যাই।

পুবদিকে রঙ ধরবার ঠিক আগেই যখন গভীর অন্ধকার নেমে আসে তখন ছেলেরা ছেঁড়া মাদুরে, সোঁদা মাটিতে অচৈতন্য হয়ে ঘুমোয়।অসুবিধের মধ্যে, অশান্তির মধ্যে না খেলে খালি পেটে ছেলেগুলো বেঘোরে ঘুমোয়। যখন সূর্য উঠল, রোদ উঠল, গাছপাতা ঝকমক করে উঠল তখন এবং তারপর যখন রোদ চড়া হয়, বাতাস গরম হয়, মাঠে ছেড়ে দেওয়া গরুগুলো মাটি শুঁকে শুঁকে শুকনো ঘাস খেয়ে ফেরে তখনও ছেলেদের ঘুম শেষ হচ্ছে না।

ন্যাড়া বেলতলা থেকে একটু দূরে প্রায় সকলের চোখের সামনেই গতরাতের শকুনটা মরে পড়ে আছে। মরার আগে সে কিছু গলা মাংস বমি করেছে। কত বড় লাগছে তাকে! ঠোঁটের পাশ দিয়ে খড়ের টুকরো বেরিয়ে আছে। ডানা ঝামড়ে, চিৎ হয়ে, পা দুটো ওপরের দিকে গুটিয়ে সে পড়ে আছে। দলে দলে আরও শকুন নামছে তার পাশেই। কিন্তু শকুন শকুনের মাংস খায় না। মরা শকুনটার পাশে পড়ে রয়েছে অর্ধস্ফুট একটি মানুষের শিশু। তারই লোভে আসছে শকুনের দল। চিৎকার করতে করতে। উন্মত্তের মত।

আশপাশের বাড়িগুলো থেকে মানুষ ডেকে আনছে মৃত শিশুটি।

ই কাজটো ক্যা করল গো? মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমে গেল আস্তে আস্তে। শুধু কাদু শেখের বিধবা বোনকে দেখা যায় না। সে অসুস্থ। দিনের চড়া আলোয় তাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

১৯৬০

তৃষ্ণা

বড় ছেলেটা ক্রমাগত লম্বা হয়ে চলল। তার মা বলে বোশেখ মাস থেকেই ছোঁড়াটা লম্বা হতে শুরু করেছে। তারপর সেই বছরেরই যখন মাঘ মাস তখন তার দিকে চাওয়া যায় না। সে তার ভাইদের সঙ্গে মাঠে যেত ধানের শীষ কুড়োতে। তার ছিল লম্বা কঞ্চির মত নীরস আঙুল। হেঁট হয়ে মাটি থেকে শীষ কুড়িয়ে নিত মুহূর্তে। তার আঙুলগুলো কিলবিল করত সাপের মত, সেগুলোর তিনটে গাঁটের ওঠানামা চোখে পড়ত আর অন্য ছেলেরা বলত হিংসা করে, শালা, থা পাড়তে দেয় না, দেখতে দেখতে কুড়িয়ে লেবে। পাঁচজনের সঙ্গে জমিতে নামলে সে একাই ওদের চারজনের সমান শীষ জোগাড় করবে। প্রত্যেকবার নিচু হওয়ার সময় পট পট করে তার হাঁটুর জোড় ফুটত।

সে মাছ ধরতে পুকুরে নামত। সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়ে বোয়াল মাছের টুঁটি চেপে ধরত। কনুই পর্যন্ত গাছের কোটরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাচ্চা শালিখ বের করে আনত। পাড়াগাঁয়ের চাষীর ঘরের চৌকস ছেলের মত সব সূক্ষ্ম কাজেই সে ছিল নিপুণ।

আসলে ছেলেটা ছিল অত্যন্ত জোগাড়ে। এক কোঁচড় মুড়ি নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। ফিরত, হয় কাদা মেখে মাছ নিয়ে, নয় কাঁচা আম আমড়া নিয়ে, কি চুরি করে কয়েকটা আলু কিংবা কচু নিয়ে। বছরের প্রথম যেদিন ভারি বর্ষণ হয়ে যেত, ভেজা মাটির গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আর দুধে ভেজা পাউরুটির মত মাটিতে পা ডুবিয়ে সে জাল কিংবা 'পলুই' নিয়ে বেরিয়ে যেত। তার মা বলত, ওরে খালভরা, যাস না, সাপে কামড়াবে।

কামড়াকগো, তু চুপ করে দিকিন।

কামড়াইলে মরবি যে বাঁশেচাপা!

মরিতো তোর কি হারামজাদি?

ওর বাপ অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে জেগে উঠত, ওর মা বলত, দ্যাখো দিকিন, বাচেদ যেচে এই রেতে মাছ ধরতে।

মরুক খচ্চর, মরুক শালার ব্যাটা শালা। চিৎকার করে গাল দিয়ে একবারে চুপ করে যেত বাশেদের বাপ।

পুকুর থেকে উঠে-আসা বড় বড় কই আর লাল রং-এর পুরনো মাগুর ভর্তি কোঁচড় নিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরত, লোভে তার মায়ের চোখ বড় বড় হয়ে উঠত। সে নিরীহ কণ্ঠে বলত, ভালো করে ঝালে দগদগে করে রাঁধবি বুঝলি মা!